যেতে নাহি দিব – সারাংশ / অধ্যাপক অদিতি চট্টোপাধ্যায়

'যেতে নাহি দিব' *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। পিতা দেবেন্দ্রনাথের আদেশে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুরে জমিদারি পরিদর্শনের কাজে বসবাস করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সময়ে *সোনার তরী* কাব্যগ্রন্থ লিখিত। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তিনি।

'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির সূচনা ঘটেছে কর্তব্য এবং স্নেহের টানাপোড়েনের একটি গল্প দিয়ে। আশ্বিন মাস শেষ হয়েছে। উমা তার সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে ফিরে গিয়েছেন শ্বশুর বাড়ি। বাঙালির ঘরে ঘরেও শুরু হয়েছে ফেরার প্রস্তুতি – 'পুজার ছুটির শেষে / ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূর দেশে/ সেই কর্মস্থানে'। হেমন্তের জনশূন্য দুপুরে গৃহিণী সাশ্রু নয়নে বেঁধে দিচ্ছেন সোনামুখী ডাল, সরুচাল, পান-সুপারি, পাটালি গুড়, ঝুনা নারকেল, রাই সরষের তেল, আমচুর, দুধ, মিষ্টি, ওষুধ ইত্যাদি সামগ্রী, যা ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রিয়জনের স্নেহের স্পর্শ এনে দেয়। বাইরে অপেক্ষারত গাড়ি। বক্তার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। এই বিচ্ছেদ উমার পতিগৃহের যাত্রার থেকেও বেশি মর্মান্তিক কারণ বক্তাকে চার বছরের কন্যা, স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যেতে হবে আত্মীয়-বন্ধুহীন একাকীত্বের জগতে। গৃহিণী নীরবে আঁচলে চোখ মোছে। দরজার কাছে বসে থাকে অস্নাত, অভুক্ত চার বছরের কন্যা। বিদায়ের কালে ম্লান মুখে বলে ওঠে,

‘যেতে আমি দিব না তোমায়’। কিন্তু ‘তবু হায় / যেতে দিতে হল!’ কর্তব্য স্নেহের বাঁধন মানে না। পুজোর সময় পরিজনের কাছে ফেরা এবং পুজোর সময় আবার দূরে চলে যাওয়া—এই মিলন ও বিরহ প্রত্যেক বাঙালির ঘরের গল্প। সহজপাঠ তৃতীয় ভাগেও এই বিচ্ছেদের ছবি—স্টীমার আসিছে ঘাটে, পড়ে আসে বেলা/ পূজার ছুটির দল, লোকজন মেলা,/ এল দূর দেশ হতে বৎসরের পরে/ ফিরে আসে যে যাহার আপনার ঘরে’। রবীন্দ্রনাথের জীবনও কিছু ব্যতিক্রম নয়। কবি পত্নী মৃণালিনী দেবী তখন সন্তান সম্ভবা। পরিকল্পনা ছিল শরৎকালটা জোড়াসাঁকোতে থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে রেখে আসবেন স্ত্রীকে এবং তিনি ফিরে আসবেন শিলাইদহে জমিদারি পরিদর্শনের জন্য। কিন্তু কবিতার চার বছরের কন্যাটির মতো লেখকের শিশু পুত্র কন্যারাও তাকে যেতে দিতে চায় নি। কবির বড়ো মেয়ে বেলির বয়স তখন ছয় বছর। নিশ্চিত ভাবে সেই স্মৃতির আলোড়নে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর ‘যেতে নাহি দিব’ কবিতাটি লেখা হয়েছিল। পুত্র-কন্যার বিচ্ছেদে কবি এতটাই দুঃখিত হন, যে ঐ বছরই সাধনা পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পিতা কন্যার বিচ্ছেদ সম্পর্কে লিখলেন *কাবুলিওয়ালা* । শরতের মাঠ দেখলে কবির মনে হয়, ‘একেবারে মাঠের একপার হতে আরেক পার পর্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হিতে আর চোখ ফেরানো যায় না। শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে। সেজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমনি করিয়া চোখ পড়ে। ... শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার এই হাসি, এই কান্না’ (শরৎ প্রবন্ধ, পরিচয় প্রবন্ধাবলী)। কবিতাতেও তাই পরিবার ছেড়ে

যাওয়ার পথে শস্য ক্ষেতের রোদ পোয়ানো, শীতের ভরা গঙ্গা, মাতৃদুগ্ধ খেয়ে পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন সদ্যোজাতের মতো ভাসমান মেঘখণ্ড বক্তার বেদনা তীব্রতর করে তোলে। শরতের এই শিশুটি আর বক্তার চার বছরের ছলোছলো চোখের মেয়েটি এক হয়ে যায় বক্তার বাৎসল্য মিশ্রিত চোখে। কন্যার কণ্ঠস্বর সমস্ত আকাশ পৃথিবী জুড়ে বেজে চলে – 'একমাত্র মর্মান্তিক সুর/ যেতে আমি দেব না তোমায়'।

কিন্তু কবিতাতে এই যেতে দিতে না চাওয়া কেবল কর্মস্থলে যেতে না দিতে চাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। প্রিয় মানুষকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে দিতে না চাওয়ার অসহায় আকুতির সঙ্গে এক করে দিলেন। আর এখানেই বাবা মেয়ের পুজোর ছুটির পরে বিচ্ছেদের গল্প কবিতা হয়ে উঠল। মানুষ তার প্রিয় মানুষটিকে কিছুতেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে দিতে চায় না। প্রকৃতিতেও সেই একই আকুতি। মাতা বসুমতী ক্ষুদ্র তৃণরাজিকে বুকে আঁকড়ে রেখে 'কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'। সারা পৃথিবীর বুক জুড়ে শোনা যায় –'সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে গভীর ক্রন্দন...যেতে নাহি দিব'। 'তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়'। মানুষের ভালবাসা, আনন্দের মাঝে বাসা বেঁধে থাকে মৃত্যুর আশঙ্কা—'ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে/ বেঁধেছিস বাসা/ যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর/ স্নেহ-ভালবাসা' (প্রতীক্ষা)। 'তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব--/...যতবার পরাজয় ততবার কহে—'আমি ভালবাসি যারে/সেকি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে'। এই মানুষের চিরকালীন অসহায়

জিজ্ঞাসা। যেমন করে বক্তার চার বছরের মেয়ে জলভরা চোখে বক্তার দ্বার রোধ করে করে বসে থাকে, তেমনি মানুষ তার প্রিয়জনকে কিছুতেই মৃত্যুর পরপারে চলে যেতে দিতে চায় না। চার বছরের মেয়েটি, অনন্ত সংসার, রৌদ্রতপ্ত বসুন্ধরা, সোনার আঁচল বুকে টেনে ম্লান অশ্রুছলোছলো মুখে বলে ‘যেতে নাহি দিব’। এই কথাটিই কবিতাটিতে পুনরাবৃত্ত হয়েছে এবং কবিতার প্রাণ।